বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

আলেখ্য অন্তরে আলেখ্যের অন্দরে

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Birendrakrishna Bhor:
Alekhya Antare Alekhyer Andare

Manabendra Mukhopadhyay

First Impression:
6 October, 2021 (*Mahalaya* 1428 BS)

© Manabendra Mukhopadhyay

Cover design & Layout:
Adwaita Krishna Basu

Photographs:
Sagnik Samanta, Betar Jagat, Ei Samay, The Statesman, Kolkata Betar(Book)

Published by: Parantap Chakraborty
Birutjatio Sahitya Sammiloni
Kalimohan Pally, Ward no.-6
Bolpur, PIN-731204
Ph no. +91 96357 27331

Printed at: Sarat Impressions Pvt. Ltd.
18B, Shyamacharan Dey Street,
Kolkata - 700073

Price: Rs. 250

ISBN: 978-93-91736-06-4

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the copyright holder.

কিশোরবেলায় ফেলে আসা সেই শীতলপাটি বিছানো উত্তরের বারান্দা, অ্যালার্ম
ঘড়ি, শিউলি আর স্থলপদ্ম গাছ, ঘাসের আগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দু,
ফিলিপস্ ফিলেটা রেডিয়ো, শারদপ্রাতের নরম সূর্য
তোমাদের খুব মনে পড়ে

কৃতজ্ঞতা

'বীরুৎজাতীয়' প্রকাশনার তিন অত্যুৎসাহী তরুণ বন্ধু শ্রীপরন্তপ চক্রবর্তী, শ্রীসোমজিৎ হালদার এবং সর্বোপরি শ্রীঅদ্বৈতকৃষ্ণ বসুর বরাভয়ে এই বইটির প্রকাশ সম্ভব হল। ওঁদের আন্তরিকতা ও উৎসাহ এককথায় তুলনারহিত। ওঁদের জন্য শুধু ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা। ভ্রাতৃতুল্য অদ্বৈতকৃষ্ণ যে এর পিছনে কী কঠিন পরিশ্রম করেছেন তা একমাত্র আমিই জানি। তাঁর প্রতি আমার বিশেষ স্নেহ-শুভেচ্ছা রইল। প্রচ্ছদ-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে মুদ্রণশিল্পের সব ভাবনাই মূলত তাঁর আর সোমজিতের। আকাশবাণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রাক্তন আর বর্তমান যাঁরা আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন– সেই শ্রীমিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌম্যেন বসু, শ্রীসুব্রত মজুমদার, শ্রীমতী কৃষ্ণশর্বরী দাশগুপ্ত, শ্রীকওসর জামাল এবং শ্রীসিদ্ধার্থ মাইতির প্রতি রইল সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা ও নমস্কার। বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল তরুণ তথ্যচিত্রী শ্রীঅরিন্দম সাহা সরদারের প্রতি। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' আর্কাইভসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। তরুণ বন্ধু, 'মহিষাসুরমর্দিনী'র আন্তরিক অনুরাগী শ্রোতা শ্রীঅভীক কর্মকার আমাকে অনেকগুলি পুরোনো ইউটিউব লিংক খুঁজে দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার অন্তহীন ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই। কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের পিডিএফ পাঠানোর জন্য বহরমপুর কে.এন. কলেজের তরুণ অধ্যাপক শ্রীঅভিষেক ঘোষালকে জানাই আমার সস্নেহ প্রীতি। *শ্রীশ্রীচণ্ডী* এবং তৎসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি নির্বাচন করেছি আমি নিজে। আমার বন্ধু, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীঅর্জুন সেনশর্মা কথাপ্রসঙ্গে একদিন সেগুলি অনুমোদন করায় স্বস্তিবোধ করেছি। তাঁকে ভালোবাসা জানাই। 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সম্পাদনা করতেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। তাঁর জামাতা অধ্যাপক শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্তী সুধীরবাবু সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। আর প্রণাম জানাই সংস্কৃতমন্ত্রমহার্ণবে আমার একমাত্র 'লাইফ বোট' শ্রদ্ধেয়া কল্পিকাদি– বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী কল্পিকা মুখোপাধ্যায়কে।

পরোক্ষভাবে আরো অনেক লেখক, অনেক মানুষের প্রতি ঋণ অনুক্তই রয়ে গেল। সবার জন্যই রইল সশ্রদ্ধ প্রণতি ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সূচি

নিবেদন	৭
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভোর: আলেখ্য অন্তরে	১৩
আলেখ্য মহিষাসুরমর্দিনী: অন্দরের অভিমুখে	২৩
মহিষাসুরমর্দিনী: আলেখ্যের ইতিকথা ও তার সাংস্কৃতিক সংকেত	৪৩
সটীক মহিষাসুরমর্দিনী: প্রচল পাঠ (১৯৭৩)	৬৫
প্রচল পাঠ আর ছেষট্টির পাঠ: আলেখ্যের অন্দরে	১১৫
অন্ত্যকথা	১৩৪

নিবেদন

গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও প্রকরণের কিছু আভাস শুরুতেই পাঠকদের কাছে নিবেদন করার প্রয়োজন বোধ করছি। 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামের যে বেতার-অনুষ্ঠানটি গত নব্বই বছর (১৯৩২-এ ভিন্ন শিরোনামে শুরু) যাবৎ প্রচারিত হয়ে আসছে, এই গ্রন্থের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে সেই কিংবদন্তিতুল্য আলেখ্যটি। বাঙালির ব্যক্তিগত ও সামূহিক চৈতন্যে এই অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। অধিকাংশ সাধারণ মানুষ 'মহালয়া' বলতে বোঝেন বাঙালির একান্ত নিজস্ব এক 'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভোর।' আবার অনেকে এও জানেন, আকাশবাণীর 'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভোর' আসলে গৌরবে একবচন। বাণীকুমার, পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নামক মহাজনত্রয়ী বা 'ট্রিনিটি'র এ এক জাদুকরী যৌথরচনা; যা এখনো আবিষ্ট করে রেখেছে ধর্মপ্রাণ-ধর্মউদাসীন নির্বিশেষে আপামর বাঙালিকে। ধর্মউদাসীন বা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্নধর্মীদেরও যে আদরের ও শ্রদ্ধার উৎসার হয়ে উঠেছে এই অনুষ্ঠান তার কারণ নিহিত রয়েছে আলেখ্যটির সূক্ষ্ম শিল্পরহস্যে। শাস্ত্র,সংগীত ও সাহিত্যরস– এই তিনের ত্রিবেণী-সংগম এই আলেখ্য। শ্রাব্যমাধ্যমে পরিবেশিত হয় বলে এর বাচিক ও সাংগীতিক উপস্থাপনাকে বলতে পারি আলেখ্যটির 'শ্রুতিপাঠ'। সাহিত্যের পরিভাষায় শ্রুতিপাঠটিও একটি টেক্সট। এই শ্রুতিপাঠের সঙ্গেই আমাদের কয়েক প্রজন্ম ধরে গড়ে উঠেছে শ্রবণেন্দ্রিয় ও মানসেন্দ্রিয়ের নিবিড় সন্নিকর্ষ। আবার সেই টেক্সট অসংখ্যবার শুনে শুনে পাঠোদ্ধার ও সাধ্যমতো পাঠশুদ্ধিসাধন করে যদি প্রস্তুত করা যায় আস্ত একটা লিখিত স্ক্রিপ্ট তাহলে তার নাম দেওয়া যেতে পারে আলেখ্যটির 'লেখ্যপাঠ'। সেই লিখিত স্ক্রিপ্টও একটি টেক্সট। লেখ্যপাঠ বা লিখিত পাঠ বস্তুত লিখিত সাহিত্য-সীমানার অন্তর্গত। অন্যদিকে শ্রুতিপাঠটি হল অভিকরণ শিল্প বা পারফর্মিং আর্টের টেক্সট। আমরা লেখ্যপাঠটিকে শ্রুতিপাঠের থেকে তফাত করেছি একক উদ্ধৃতিচিহ্নের বদলে বাঁকা হরফে *মহিষাসুরমর্দিনী* লিখে। (সূচিপত্র ব্যতিরেকে এই গ্রন্থমধ্যে এছাড়া বাঁকা হরফ ব্যবহৃত হয়েছে কেবলমাত্র গ্রন্থনামের ক্ষেত্রে। প্রবন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে একক ঊর্ধ্বকমা প্রয়োগের নীতি।) সে যাই হোক, কেন আমাদের দুটি টেক্সট আলাদাভাবে স্বীকার করতে হল তারও একটা ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন

আছে বোধহয়। এই প্রয়োজনটা বিশেষ করেই বোধ করলাম যখন আলেখ্যটির অন্য একটি ভার্সান আকাশবাণীর সৌজন্যে আমাদের প্রথম শোনার সুযোগ হল ২০১৭ সালের মহালয়ার ভোরে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এই ভার্সানটিই কার্যত আকাশবাণী সম্প্রচার করে চলেছে। হয়তো এইধারা ভবিষ্যতেও চলবে। বহুপ্রচলিত ভার্সান আর ২০১৭ সালে পুনঃপ্রচারিত ১৯৬৬ সালের ভার্সান ছাড়া তৃতীয় আরেকটি ভার্সান আমাদের শোনার সুযোগ হয়েছে সম্প্রতি। আমরা এই বইতে প্রয়োজনে সর্বত্র তাকে 'তৃতীয় ভার্সান' বলে চিহ্নিত করেছি। এই তৃতীয় ভার্সানটি কবে প্রথম রেকর্ড হয়েছিল বা প্রচার হয়েছিল তা অবশ্য নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারেননি আমাদের। তবে এটিকেই আমাদের জানা 'মহিষাসুরমর্দিনী'র তিনটি পূর্ণাঙ্গ ভার্সানের মধ্যে আদিতম মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

২০১৭ সালে মুঠোফোনে রেকর্ড করে নিয়েছিলাম– সেইসময় পর্যন্ত আমার অজ্ঞাত, সেবারই প্রথম শ্রুত অন্য এক 'মহিষাসুরমর্দিনী'। তারপর বারবার করে শুনে শুনে তৈরি করা হয়েছিল সেই নতুন 'মহিষাসুরমর্দিনী'রও একটি লেখ্যপাঠ। দুই *মহিষাসুরমর্দিনী* যখন পাশাপাশি রেখে তুচ্ছ খুঁটিনাটিসমেত তুলনা করে চলেছি, তখন দেখি গান ও স্তোত্রের বিন্যাসে অনেকটাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে দুটো স্ক্রিপ্ট। কন্টেন্টের সংযোজন-বিয়োজনও তাতে ঘটেছে বেশ খানিকটা। শুধু তাই নয়, আলেখ্যদুটিতে গানের বিন্যাস-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত দুটো গানের সুরও গেছে বদলে। 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সূচনায় 'যা চণ্ডী' সমবেতকণ্ঠের সংগীত হিসেবে ছিল বহুশ্রুত ভার্সানটিতে। ২০১৬ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে ভার্সানটি রেডিয়োতে শুনছি তাতে 'যা চণ্ডী' সুরে ভাসিয়ে একক কণ্ঠে পাঠ করছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। আর সুর-বদলে যাওয়া সংগীতটি হল বিমলভূষণের কণ্ঠে গীত 'নমো চণ্ডি'। এখন গানের বাণী যদি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে অথচ সুর যায় বদলে তাহলে লেখ্যপাঠের সাক্ষ্যে তাকে ভিন্ন বলে চিহ্নিত করা যায় না। অথচ সুরে সমর্পিত হলেই বোঝা যায় সে-দুটি কত আলাদা! এই কারণেই লেখ্য আর শ্রুতি– এই দুরকম পাঠ স্বীকার করা অনিবার্য হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। এই দুটি লেখ্যপাঠের তুলনামূলক আলোচনা– অর্থাৎ সাহিত্যশিল্পগত বিচার আমাদের বিশেষ অন্বিষ্ট। স্ক্রিপ্টের তুলনামূলক আলোচনায় এই যুক্তিতেই আমরা প্রয়োজনস্থলে 'সংগীত' কথাটি ব্যবহার না করে লিখেছি 'গান'। গান সুরে সমর্পিত না হলে; অর্থাৎ সম্যকভাবে গীত না হলে তাকে 'সংগীত' বলা সমীচীন নয় বলেই মনে করি। যখন গানের সঙ্গে তার গীতরূপ নিয়ে কথা বলেছি তখন অবশ্য 'সংগীত' শব্দটি ব্যবহার করেছি কখনো-সখনো। আর আলেখ্যটি নিয়ে আমাদের আলোচনা যেহেতু একান্তভাবে সাহিত্যগত বা লেখ্যরূপগত নয়; অধিকন্তু তার

শ্রুতিরূপ নিয়েও আলোচনা, সেইজন্য দুয়েকটি জায়গায় বা অধ্যায়ে আমাদের এই স্বনির্বাচিত রীতি স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করা হয়েছে। একইভাবে চেষ্টা করেছি দুটির শ্রুতিপাঠের তারতম্য বোঝাতে দুটি সালের উল্লেখসহ 'ভার্সান' কথাটি ব্যবহার করতে, আর স্ক্রিপ্ট বা লেখ্যপাঠের ক্ষেত্রে 'এডিশন' বা 'পাঠ' শব্দটি প্রয়োগ করতে। ভার্সান/এডিশন বা পাঠ অভিধাগুলি যে কখনো-সখনো ঠাঁইবদল করে নেয়নি তাও অবশ্য হলফ করে বলা যাচ্ছে না।

নামকরণ হল যে-কোনোরকম স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম মুখ্য অভিজ্ঞান। ভার্সানের নামকরণের জন্য আমরা বেছে নিয়েছি একটা বিশেষ সূত্র। যে-পাঠটি বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত সেইটির নাম আমরা দিয়েছি 'তিয়াত্তরের পাঠ বা ভার্সান'। নামান্তরে এটিকেই কখনোবা বলেছি 'প্রচল পাঠ (১৯৭৩)'। আর ১৯৬৬-র পর ২০১৭ সালে যে আলেখ্যটি আকাশবাণী আমাদের শোনবার সুযোগ করে দিয়েছে তার নাম দিয়েছি 'ছেষট্টির পাঠ বা ভার্সান'। আকাশবাণীর কর্মকর্তারা ২০১৭ সালে জানিয়েছিলেন, অতিপরিচিত আলেখ্যটি ১৯৭২ বা ১৯৭৩ সালের রেকর্ডিং। আর দ্বিতীয়োক্ত পাঠটির রেকর্ডিং হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। এইখানে একটি জরুরি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। কোনো বইয়ের পাঠ-পাঠান্তর বিচার আর শ্রুতিমাধ্যমে সম্প্রচারিত রেকর্ডেড কোনো প্রোগ্রামের ভার্সানের 'পাঠান্তর' (বলা যায় 'শ্রুত্যন্তর') বিচার ঠিক একই নিক্তিতে বিবেচ্য হতে পারে না। আকাশবাণীর প্রাক্তন কর্মকর্তা মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, বাহাত্তরে শেষবার রেকর্ডিং হয়ে থাকলেও তিয়াত্তরে একটি নতুন এডিশন প্রচার করে আকাশবাণী। ওই এডিশনটিই বহুদিন ধরে যত্রতত্র বাজতে শোনা যায়। ২০১৬ পর্যন্ত আকাশবাণীও এইটিই সম্প্রচার করে এসেছে। তিয়াত্তরের ওই ভার্সানে মিশে আছে তার আগের আগের রেকর্ডিঙের অংশ। ছেষট্টির ভার্সান সম্পর্কেও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। এই বইতে এরকম সম্ভাবনা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং তিয়াত্তর বা ছেষট্টিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ না করে দুটো ভার্সানের চিহ্ননাম হিসেবেই বিবেচনা করা সংগত হবে। প্রসঙ্গত বলি, আলাদাভাবে অনেকগুলো গান ও স্তোত্রের রেকর্ড যে আছে আকাশবাণীর সংগ্রহে তা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত অনেকেই আলেখ্যটির স্মৃতিচারণসূত্রে কোথাও কোথাও বলেছেন। সেগুলি নিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে একাধিক কপি সম্পাদনা করে রাখা হত আকাশবাণীর সংগ্রহালয়ে। কাজটা করতেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। লাইভ সম্প্রচারের যুগ শেষ হওয়ার পর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত অন্তত এই ব্যাপারটা চলেছে বলেই জানা যাচ্ছে। তবে এডিটিং বলতে নেহাত কিছু শব্দের জোড়াজুড়ি হলে আমরা তাকে এডিশন বলছি না। এডিশন বা ভার্সান বলব তাকেই যেখানে বিন্যাস বা পরিকল্পনাগত দিক থেকেই একটা বিশেষ অভিমুখগত তফাত দেখতে পাব।

মোদ্দা কথাটা হল, 'মহিষাসুরমর্দিনী' আলেখ্যটিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিদ্যার বিদ্যায়তনিক চর্চার অভিমুখে চালিত করতে চেয়েছি আমরা। বাঙালির স্মৃতিকাতরতা এবং যৌথ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও ছুঁয়ে আছে আলোচনার বেশ কিছুটা পরিসর। বাঙালি বছরে মাত্র একদিন এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে নস্ট্যালজিক হয়। সেই আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও মনে হয়, কেবল আবেগ আর নস্ট্যালজিয়ার বাৎসরিক শ্রদ্ধাতর্পণ করলেই বাণীকুমার-পঙ্কজকুমার-বীরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতি আমাদের সাংস্কৃতিক পিতৃতর্পণ যথাযথভাবে সম্পূর্ণ হয় না। এই বইটি সেই উদ্দেশ্যে একটি আন্তরিক পদক্ষেপ। খুব সম্ভব 'মহিষাসুরমর্দিনী'র উপর বাংলায় এইধরনের গবেষণামূলক কাজের এটি প্রথম প্রয়াস।

কিন্তু আমার পক্ষে সেকাজের প্রতিবন্ধকতাও বিস্তর। আমি সংস্কৃতের ছাত্র নই। স্থির করা হল, পাঠপ্রস্তুতির ক্ষেত্রে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন; এবং বিশেষ করে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচণ্ডী*র বঙ্গানুবাদদুটিই কেবল অনুসরণ করে যাওয়া হবে। তবে তত্ত্ববিচারের প্রশ্নে আরো অনেক নাম জুড়ে নেওয়া যেতেই পারে। বঙ্গানুবাদের প্রশ্নে আরো স্থির করে নেওয়া হল, মূল বঙ্গানুবাদ হুবহু গ্রহণ না করে সহজ বাংলায় তার ভাবানুবাদ করে নেওয়া হবে। আর স্থির করা হল, সংস্কৃত স্তোত্রাংশগুলি মিলিয়ে নেওয়া হবে ওই দুই বরেণ্য পণ্ডিতের সম্পাদিত গ্রন্থ অনুসরণ করেই। কার্যক্ষেত্রে আমরা বঙ্গানুবাদে বেশি সাহায্য নিয়েছি স্বামীজির অনুবাদের। ভাবানুবাদের নীতি নিয়েছি পাঠকের সুবিধার্থে অনুবাদের মধ্যে প্যারাফ্রেজিং করে দেওয়া সুবিধা হবে এই বিবেচনায়। মান্য গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার ওই একই নীতি গৃহীত হয়েছে *ঋক্‌বেদ* ও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের 'মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্'-এর ক্ষেত্রেও। *ঋক্‌বেদ*-এর দশম মণ্ডলের 'দেবীসূক্ত'-এর শ্লোকটির ভাবানুবাদে অবলম্বন করা হয়েছে শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তের *ঋগ্বেদ-সংহিতা*। গানগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেবীর প্রতি সম্বোধনসূচক। প্রত্যক্ষ সম্বোধনস্থলে আমরা ঈ-কার স্থানে ই-কার ব্যবহার করেছি। যেমন, 'দেবি', 'চণ্ডি', 'চিন্ময়ি' ইত্যাদি।সচেতনভাবেই এখানে এইভাবে বানান প্রয়োগ করা হয়েছে পূর্বোক্ত পণ্ডিতপ্রবরদের অনুবাদের বানানের সঙ্গে একরকম তালমিল রক্ষা করে চলার তাগিদে। এইধরনের শব্দের ক্ষেত্রে স্বয়ং বাণীকুমার কীরকম বানান ব্যবহার করতেন তা জানবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম একসময়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন মহতী একটি অনুষ্ঠানের প্রামাণ্য কোনো স্ক্রিপ্ট আকাশবাণীতে সেভাবে সংরক্ষিত হয়নি! শিল্পীরাও কেউ এই স্ক্রিপ্ট সযত্নে রক্ষা করেছিলেন বলে জানা নেই। যখন আলেখ্যটির মান্য স্ক্রিপ্টগুলি হাতড়ে চলেছি আপ্রাণ চেষ্টায়, তখন ৭ অক্টোবর ২০১৮ সালের 'এইসময়'

কাগজে প্রকাশিত কুশল সিংহরায়ের একটি প্রতিবেদনের কাটিং পাওয়া গেল আমারই 'মহিষাসুরমর্দিনী' সংক্রান্ত একটি ব্যক্তিগত ফাইলে। তাতে জানা গেল, একসময় শিল্পীদের জন্য একটি করে হাতে-লেখা স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দিতেন আকাশবাণীর সেইসময়ের কর্মী এবং বাণীকুমারের বিশেষ আস্থাভাজন শ্রীধর ভট্টাচার্য। প্রতিবেদনের সঙ্গে দেওয়া ছিল স্ক্রিপ্টের প্রথম পাতার আংশিক ছবি। শ্রীধর ভট্টাচার্যের পুত্র সনৎ ভট্টাচার্য যত্ন করে এরকম একটি স্ক্রিপ্ট রক্ষা করেছিলেন। সনৎবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় আমাকে কেউ বাতলে দিতে পারেননি। সেই আক্ষেপ খানিকটা মিটল যখন বইলেখার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে! 'জীবনস্মৃতি' আর্কাইভসে পাওয়া গেল 'ত্রিগুণা প্রকাশনী' থেকে ১৯৫৯ সালে (ভাদ্র ১৩৬৬) প্রকাশিত 'মহিষাসুরমর্দিনী'র একটি মুদ্রিত পাঠ। আমাদের বইতে সেটি উল্লিখিত হয়েছে 'ত্রিগুণা পাঠ' নামে। ইতোমধ্যে আমরা নিজেরাই শ্রুতিসূত্রে তিয়াত্তর ও ছেষট্টির দুটি লেখ্যপাঠ প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম। বস্তুত 'ত্রিগুণা পাঠ'-এর প্রায় সবকটা বাংলা গান আর কিছু শ্লোকাংশই আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। বিধিনিষেধ থাকায় গোটা পাঠটা দেখার সুযোগ ঘটেনি আমাদের। কিন্তু যতটুকু দেখেছি তাতেই মালুম হয়েছে, তিয়াত্তর এবং ছেষট্টির পাঠের নিরিখে এই পাঠ অনেকটাই স্বতন্ত্র। বরং আকাশবাণীর সংগ্রহে থাকা যে 'তৃতীয় ভার্সানটি'র কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে অনেকবেশি মেলে এই 'ত্রিগুণা পাঠ'। তবে সম্পূর্ণই যে মেলে তা বলা যায় না। এটি যেহেতু ১৯৬২ সালের আগে প্রকাশিত, সুতরাং এটি 'লাইভ সম্প্রচার' যুগের কোনো স্ক্রিপ্ট বলেই মনে হয় আমাদের। তবে গানগুলির কথার জট ছাড়াতে কখনো-সখনো 'ত্রিগুণা পাঠ' আমাদের বিশেষ কাজে এসেছে। এসব বিষয়ে আরো কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হবে।

তুলনামূলক আলোচনার জন্য আমরা ভিত্তিপাঠ (Base Text) হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছি তিয়াত্তরের পাঠটিকেই, কারণ এটিই বহুশ্রুত এবং এখন প্রযুক্তির কল্যাণে সহজলভ্যও বটে। আর তিয়াত্তরের পাঠটির ভাষ্য ও গানের বাণীর মান্যপাঠ নির্ণয় করতে হয়েছে মূলত বারংবার শুনে শুনে; এবং গানের বাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে তার অর্থগত, মিলগত সাযুজ্য নজর করে করে। ছেষট্টির ভার্সানের ধ্বনির স্পষ্টতা খানিকটা সহায়ক হয়েছে তিয়াত্তরের ভার্সানের গানের পাঠ নির্ণয় করবার ক্ষেত্রে। তার একটা ঝুঁকির দিকও আছে। এই দুই পাঠের অন্তর্গত একই গানের সুর ও স্বরের রকমফের অতিসূক্ষ্ম হলে এই শ্রুতিপদ্ধতিতে সেই পাঠান্তর কিন্তু অধরাই থেকে যায়। আর ভার্সানভেদে গানেরও যে 'পাঠভেদ' ছিল তা নিয়ে আমরা এখন নিঃসংশয়। তবু এই পুনঃপুন শ্রুতির নীতিই আমাদের

নিতে হয়েছে কারণ তিয়াত্তরের পাঠের যেসব স্ক্রিপ্ট ফেসবুক ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে ভেসে আসছে আজকাল; অথবা আজকের শিল্পীরা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে 'মহালয়ার গান' হিসেবে গাইছেন যেসব গান, তার মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি আমাদের নজরে এসেছে। সে যাই হোক, ছেষট্টির স্ক্রিপ্টও রচনা করে নিতে হয়েছে আমাদের শ্রুতিসম্বল করেই। কখনো এই দুটি পাঠের মান্য লিখিতরূপ হস্তগত হলে তখন আমাদের শ্রুতির কোথাও ত্রুটি ঘটে থাকলে তাও শুধরে নেওয়া যাবে। যে-দুটি পাঠ নিয়ে আলোচনা; সেক্ষেত্রেও আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আর সামান্য বোধবুদ্ধির উপরই রাখতে হয়েছে ভরসা। যেখানে শ্রবণেন্দ্রিয় বা বোধবুদ্ধি হার মেনেছে সেখানে স্বীকার করে নিতে হয়েছে আমাদের সেই অপারগতা।

প্রয়োজনের দাবিতে কোনো কোনো অধ্যায়ের শুরুতে সাধ্যমতো পাঠনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেকথা পুনর্বার এখানে বলা অনাবশ্যক। আশা করি অধ্যায়ের পরিকল্পনা ও নামকরণের বিশেষত্ব সহৃদয় পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন। এসবই অবশ্য বহিরঙ্গের বিষয়। মোটের উপর বলবার কথাটা এই যে বইটিকে 'মহিষাসুরমর্দিনী' গবেষণার চূড়ান্তরূপ ধরে না নিয়ে প্রায় শতবর্ষস্পর্শী একটি আলেখ্যের বিদ্যায়তনিক চর্চার খসড়া প্রস্তাব মনে করলেই আমরা বাধিত হই।

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, বইটি প্রথম থেকে অধ্যায়ের ক্রমানুসারে পড়ে গেলেই ভালো হয়। কোনো এক অধ্যায়ের প্রশ্নের বীজ হয়তো পল্লবিত হয়েছে পরের বা তার পরের কোনো অধ্যায়ে। ধরা যাক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মতো প্রবাদপ্রতিম বাচিক-ব্যক্তিত্বের কি এই আলেখ্যে কোনোদিন কোনো পাঠে সামান্যতম স্খলনও হয়েছিল?—এই জিজ্ঞাসার উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে পরের বা তার পরের কোনো অধ্যায়ে। কিন্তু সে খুব বড়ো কথা নয়। আদত কথা হল, সম্ভাব্য সবদিক থেকে বাঙালি শ্রুতিশিল্পের অন্যতম হিরণ্যস্মারক 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামক এক অনুপম ও কালজয়ী আলেখ্যটিকে পরতের পর পরত খুলতে খুলতে এগোনোই ছিল আমাদের লক্ষ্য। সেকাজে কতটা সফলকাম হওয়া গেল সেবিচার করবেন বইটির পাঠক।

৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুরব, পূর্বপল্লি(উত্তর)
শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
e-mail: manabendramukho@gmail.com

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভোর: আলেখ্য অন্তরে

সে কোন সুদূর শৈশবের কথা তা তো লেখাজোখা নেই। কতই বা বয়স তখন– পাঁচ কি ছয়? আগের রাতে ঘড়ির কাঁটা দশটা ছুঁলেই মা বলত 'কাল আবার ভোরবেলা ওঠা। তাড়াতাড়ি ঘুমো আজ।' কিছু একটা হবে কাল ভোরে! বেশ একটা উৎসবমতো কিছু। সকালে ঘুম যদি ঠিক সময় না ভাঙে এই আশঙ্কার মধ্যেই কখন তলিয়ে যেতাম ঘুমে। রেডিয়োর শাঁখে ফুঁ পড়লে ধড়মড়িয়ে উঠে বাইরে এসে দেখি, উত্তরের বারান্দায় শীতলপাটি বিছানো হয়েছে। রেডিয়োটা দেওয়ালের সামনে বসিয়ে প্রায় গোল হয়ে বসে আছে বড়োরা। একটু অভিমান হত। কেন আরেকটু আগে আমাকে ডেকে দিল না দিদি? তাহলে সেই বাজনাটা থেকেই ভোরবেলার এই রেডিয়ো-উৎসবে যোগ দেওয়া যেত!

–কোন বাজনা রে?

–ওই যে একটা বাজনা বাজে না?

বড়ো হয়ে জেনেছি আকাশবাণীর সব অধিবেশন শুরুর আগেই একটা সুর বাজে। আকাশবাণীর 'সিগনেচার টিউন'। বছরে একবারই হয় ভোরবেলায় ওই সুরেরও অকালবোধন!

ততক্ষণে আরো খানিকটা ঘন হয়েছে আসর। শুধু এবাড়ির বড়োরাই নয়, আশপাশের আরো অনেক কাকা-জ্যেঠা-পিসিরাও এসে জড়ো হয়েছে। তখনো যারা এসে পৌঁছোতে পারেনি তাদের একটা হাঁক দেওয়া দরকার। বাবার নির্দেশ পেয়ে ছোড়দা টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেল বাড়ির উত্তর সীমানায় বড়োজ্যেঠার মুদিখানা দোকানের উঠোনে দাঁড়িয়ে পাড়া

জাগাতে। বাড়ির দক্ষিণ দিকের রাস্তার গায়ে যাদের বাড়ি তাদের কেউ কেউ হাঁক দিয়ে বলল–রেডিয়োটা একটু জোরে বাজাও ঠাকুরমশায়রা। আমাদের কানেও একটু 'পেবেশ' করুক। শোনানোই তো উচিত। ওদের বাড়িতে রেডিয়ো নেই বলে এমন একটা আশ্চর্য উৎসব থেকে বঞ্চিত হবে কেন? অতএব রেডিয়োর নবে পড়ল মোচড়। বেশ গমগম করে উঠল চারপাশ। স্থলপদ্ম গাছ থেকে ঝটপট শব্দ করে উড়ে গেল হয়তো একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা।

চোখ থেকে তখন ঘুম উড়ে গেছে কোথায়! ঘোঁতনদা বলে, "গোন তো,'ইয়া দেবী'টা কতবার বলে?" আঙুলের কড় গুনতে গুনতে হিসাবে ভুল হয়ে যায়। এবছর ভুল হল? সামনের বছর ঠিক করে গুনতেই হবে! চণ্ডীপাঠ করতে করতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের গলা বুজে আসে কান্নায়। চোখের কোণ চিকচিক করতে থাকে প্রবীণ রুদ্রকালীদারও। আর ঠিক তখনই নজর পড়ে দূর্বাঘাসের আগায় ওইরকমই চিকচিকে একটা আলো।

কেউ হয়তো বলে উঠল, 'আচ্ছা এবছরেরটা কি একটু আলাদা রকম হল?' দাদা বলল, 'না না, ওই আগেরটাই।' আশির দশকের ঢের আগে থেকেই যে 'মহিষাসুরমর্দিনী' রেকর্ডে বাজা শুরু হয়েছে সেসব খবর জানা ছিল না গ্রামীণ মানুষগুলোর। কিন্তু তারা জানত বীরেন্দ্রকৃষ্ণের নাম। জানত পঙ্কজ মল্লিক, বাণীকুমারের নাম।

সাড়ে পাঁচটা বাজলে চা-বিস্কুট নিয়ে হাজির হত মা। অতিথিরা এবার বিদায় নেবে। আমার সেই কচি বয়সেই কেমন একটা দলাপাকানো অনুভূতি হতে থাকত গলার কাছে। কেন যে হত! সেটা আড়াল করার জন্য বাড়ির আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম সেই সময়টা। সামান্য একটু এগোলে একটা জংলা জায়গায় ফুটে থাকত কয়েকগুছি কাশ। কাশের গায়ের রং আর আকাশের রং যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কোথাও। মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হত মহালয়া-ভোরের সুর। শুধুই সুর। কেননা ভাষ্য বোঝার বয়স তখনো হয়নি। বাড়ি ফিরে দেখতাম, পাড়ার কোনো পিসি নারকেল নাড়ু বানাবার আয়োজন শুরু করেছে। মাটির দেওয়ালের উপর তোড়জোড় চলছে গেরিমাটির প্রলেপ দেওয়ার। এরপর পাড়ার কোনো দিদি এসে তার উপর এঁকে দেবে সুশ্রী আলপনা। বাবার হাতে দরজাগুলোতে পোচ পড়বে আলকাতরার। আলকাতরার গন্ধ এসে লাগবে নাকে। পুজো পুজো গন্ধ। পুজো তাহলে এসে গেল!

স্মৃতি আর স্মৃতি। মহালয়া-ভোরের স্মৃতির পাখিরা এখনো; এই পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বয়সে এসেও অনর্গল ডানা ঝাপটায়। এখনো মহালয়ার ভোর মানেই একসমুদ্র নস্ট্যালজিয়া।

শুধু তো আমার একার নয়; কয়েক প্রজন্ম ধরে বাঙালি এই নস্ট্যালজিয়া শিরা-ধমনীতে বয়ে নিয়ে চলেছে।

'মহিষাসুরমর্দিনী'র 'ত্রয়ী' (বামদিক থেকে) বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পঙ্কজকুমার ও বাণীকুমার

ফেসবুকের পুরোনো পাতা ওলটাতে গিয়ে চোখে পড়ল ২০১৭ সালের উনিশে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন সাত-সকালে এই কথাগুলি লিখে রেখেছিলাম:

"ভালো করে জ্ঞান ফোটার আগে থেকে আলো না-ফোটা ভোরে মহালয়া শুনছি। প্রায় চল্লিশ বছরের কান! এড়িয়ে যাবে কোথায়? এবার আকাশবাণী কলকাতা যে রেকর্ডটা শোনাল সেটা বহুশ্রুত আলেখ্যটার একটা 'পাঠান্তর'। শুরুতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সেই অননুকরণীয় 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে' বিঘোষণা ছিল বটে তবে তারও আগে, গোড়াতেই শোনা গেল তাঁর একক কণ্ঠে চণ্ডীর শ্লোকাংশ পাঠ। কোনো কোনো গানের অবস্থানও হয়ে গেল আগে-পরে। বিমলভূষণের স্তোত্রগানটির মধ্যে 'তা তা থৈ, তা তা থৈ / প্রলয় নৃত্য' অংশটির পরিচিত তালমাত্রাও গেল বদলে, কারণ এ গানের সুরই যে এই 'পাঠ'-এ বদলে গেছে খানিকটা! মানবেন্দ্রর 'তব অচিন্ত্য' গানটি রাগাশ্রয়ী হলেও, বহুশ্রুত বা প্রচলিত 'পাঠ'-এর গায়নে এমন কালোয়াতি চালটা নেই, যেমনটা আজ শুনলাম। গান না জানলে কী হবে? কর্ণকুহরের শ্রুতির স্মৃতিটা যাবে কোথায়? সেটা যে এতদিনে 'প্রত্নছাঁচ' হয়ে গিয়েছে আমাদের! একটা গান তো শুনলামই এই প্রথমবার। শেষ ভাগে। একদিকে ভালোই হল। এর অনেকগুলো 'পাঠান্তর' আছে জানতাম, তারই একটা শোনার সুযোগ হল এই প্রথম। এবারের স্ক্রিপটার কিছু কিছু দিক বেশ ভালোই লাগল। সে যাই হোক, আমার মতো অন-আচারিকের কাছে

বাণীকুমার-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ-পঙ্কজ মল্লিক 'ট্রিনিটি'র এই কীর্তিটার মূল্য একেবারেই ধর্মীয় নয়। আমার কাছে 'মহালয়া' মানে তো আসলে হাজারকাহন স্মৃতির তর্পণ!"

সত্যিই মহালয়া বলতে পিতৃপক্ষ-দেবীপক্ষ বুঝতাম না সে বয়সে। বুঝতাম শুধু দেবীপক্ষ আর অসুরপক্ষ। বিজয়ী আর বিজিতপক্ষ। আমরা সব্বাই সে যুদ্ধে দেবীর পক্ষে। বিজয়ীর পক্ষে। আশির দশকের মাঝামাঝি। আমাদের বাল্য আর কৈশোরের সন্ধিকাল। দোচালা মণ্ডপে তখনও প্রতিমার গায়ে খড়ির প্রলেপ পড়েনি। তার মধ্যেই এসে যেত ওই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভোর! অন্যরকম মায়া-আলোর ভোর। বিদ্যুৎ-বিহীন নিরালোক গ্রামের পুবদিকে আলো ফোটার আগেই তুলসিমঞ্চ আলো করে ঝরে পড়ে থাকত শিউলি। দুহাতে আঁজলা ভরে তুলে নিলে তখন সে ফুলই হত অপার্থিব আলো! আকাশে আলো ফুটতেই চিকচিক করে উঠত দুব্বোঘাসের আগায় শিশিরের মুক্তো। বেজে উঠত শঙ্খধ্বনি। তারপর তো শুধুই স্বরে আর সুরে ভেসে যাওয়া! একসময় যুদ্ধ উঠত ক্লাইমেক্সে। ঈষৎ সানুনাসিক কণ্ঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তখন ঘোষণা করছেন, 'দেবতারা সানন্দে দেখলেন, দুর্গা অসুরকে শূলে বিদ্ধ করেছেন। আর খড়্গনিপাতে দৈত্যের মস্তক ভূলুণ্ঠিত। তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনাগীতিসুষমা দ্যাবা-পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল।' আলেখ্যের বীররস তখন ভক্তি ও নিবেদনের দিকে ক্রমে বয়ে যেত। সুমিত্রা সেনের 'মা গো, তব বীণে সংগীত প্রেমললিত' থেকে শুরু হত আলেখ্যের এই অবরোহণের পালা। মোট দেড়ঘণ্টা কোনদিকে কীভাবে ঘোরের মধ্যে কেটে যেত তা টেরই পেতাম না! সমাপনী মঙ্গলশঙ্খ উঠত বেজে। চরাচরজুড়ে তখন প্রভাতী প্রসন্নতা। আর কোনো যুদ্ধগন্ধ নেই। পদ্মের পাতায় তখন শিশুর মতো টলমল করছে ভোরের সূর্য!

২০১৭-র সেই ফেসবুক পোস্টের পর সহমর্মী অনেকে নানারকম মন্তব্য করলেন। কেউ কেউ তারিফ করলেন 'মহিষাসুরমর্দিনী'র এই শ্রুতিপাঠটির। কেউবা এমন বলতেও ছাড়লেন না, প্রচলিত 'পাঠ'টি যে এবছরের নতুনটির তুলনায় নিখুঁত মনে হয়েছে কারোর কারোর, সে তাদের একান্তই দীর্ঘদিনের শ্রুতির সংস্কার! আকাশবাণীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার মতো যোগাযোগ করলেন আরো অনেকেই। ২০১৭ সালে এই ভার্সানটি বাজাবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ছিল আকাশবাণীর তৎকালীন সহ-অধিকর্তা সৌম্যেন বসুর। মনে আছে, পরদিন বিশে সেপ্টেম্বরের কাগজে তাঁর বিবৃতি বেরিয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন, ২০১৭-তে যে 'মহিষাসুরমর্দিনী' বাজানো হয়েছে তার রেকর্ডিং হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। আর প্রচলিত ভার্সানটি ১৯৭২ কিংবা ১৯৭৩ সালের রেকর্ডিং। সেই ১৯৭২-৭৩ থেকে